প্রচলিত বিভিন্ন খতম: তাৎপর্য ও পর্যালোচনা (১ম পর্ব)

প্রচলিত বিভিন্ন খতম: তাৎপর্য ও পর্যালোচনা (১ম পর্ব)

বিষয়

ভূমিকা
সুন্নাতের পরিচয় ও গুরুত্ব
সুন্নাতের পরিচয়
সুন্নাতের উপর অবিচল থাকার গুরুত্ব
বিদআতের পরিচয় ও পরিণাম:
বিদআতের সংজ্ঞা
বিদআতের পরিণাম
খতম শব্দের অর্থ ও প্রয়োগ
খতমে কুরআন
খতমে ইউনুস
খতমে বুখারী
খতমে না-রী
খতমে ইয়াসিন
খতমে শিফা
খতমে তাহলিল
খতমে তাসমিয়াহ
খতমে খাজেগান
খতমে জালালী
খতমে দুরুদে মাহি
ইখলাস দ্বারা কুরআন খতম
অভিজ্ঞতা বনাম ধর্মীয় বিশ্বাস
পরিশেষ
গ্রন্থপঞ্জি তালিকা

প্রচলিত বিভিন্ন খতম: তাৎপর্য ও পর্যালোচনা

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান রাব্বুল আলামিনের, যিনি আমাদেরকে তাঁর শ্রেষ্ঠ মাখলুক হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মদ rএর উম্মত বানিয়েছেন। দিয়েছেন সর্বশ্রেষ্ঠ চিরস্থায়ী কিতাব আল-কুরআন। এ দুইয়ের মাধ্যমে আমাদেরকে সর্বদা ও সর্বত্র কার্যকর বিধানের ধারক বাহক বানিয়েছেন। আমাদের উপর মহান আল্লাহর এসব নেয়ামত অপরিসীম। এক নবীর পর যখন আরেক নবী নতুন দীন নিয়ে আসেন, এক কিতাবের পর যখন আরেক কিতাব নতুন কিছু বিধান নিয়ে অবতীর্ন হয়, তখন স্বভাবত উম্মতের মধ্যেই দুই শ্রেণি হয়ে যেতে দেখে যায়। এক শ্রেণি নতুন নবীর উপর ঈমান আনেন, ফলে তারা মুমিনই থাকেন। আরেক শ্রেণি নতুন নবীকে মিথ্যুক আখ্যায়িত করে বেঈমান বা কাফের হয়ে যায়। আল্লাহর কৃপায় সর্বশেষ নবীর উম্মত হওয়ার সৌভাগ্যে আমরা এমন পরীক্ষামুক্ত। না নতুন নবী আসবেন, না কোনো নতুন বিধান আসবে। নতুন কোনো দীন বা পদ্ধতির অনুসরণ করব কি করব না এই ঝামেলায় আমাদেরকে কখনো পড়তে হয় না। যে নবীর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর দীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন সেই নবীর উম্মত হতে পারা কতই বড় সোভাগ্যের কথা তা পূর্বের উম্মতের ইতিহাস নিয়ে একটু চিন্তা করলেই বুঝে আসবে। তাই আল্লাহ আমাদেরকে এই বড় নেয়ামত প্রদানের জন্য আবারো তাঁর শুকরিয়া আদায় করছি।

রাসূল r এর দীন, তাঁর তরিক্বা, তাঁর আদর্শ প্রচারে সাহাবায়ে কেরাম থেকে নিয়ে যুগে যুগে একশ্রেণি তাদের জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন। ফলে ইবাদত সংক্রান্ত যেকোনো খুটিনাটি বিষয়ে রাসূল r এর আদর্শ আমাদের মাঝে বিদ্যমান। এখন আমাদের দায়িত্ব শুধুমাত্র তাঁর রেখে যাওয়া দীনের অনুসরণ। দীন পালনে তাঁর পদ্ধতির অনুসরণ। সালাত, যাকাত, সওম, হজ্জ, তেলাওয়াত দো'আ, দুরূদ, যিকর সর্বক্ষেত্রে তাঁর রেখে যাওয়া পদ্ধতির অনুসরণ অনূকরণই একজন মুমিনের কর্তব্য। এমন কোনো ইবাদত বা নেক আমল নেই যেখানে তাঁর আদর্শ নেই। ইবাদত সংক্রান্ত সব বিষয় বিবেক কর্তৃক নির্ধারণের উর্ধ্বের বিষয়, যা একমাত্র ওহীর মাধ্যমেই জানা যায়, জ্ঞানের শেষ সীমা থেকেই ওহীর সুচনা, সুতরাং তাঁর আদর্শ, পদ্ধতি,উদ্দেশ্য যেখানে নেই তা ইবাদত বা নেক আমল বলে গণ্য হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

অনেক দিন থেকেই মনে প্রশ্ন ছিল যে, কুরআন তেলাওয়াত একটি নেক আমল, হাদীস চর্চা একটি নেক আমল। অনুরূপ দো'আ, দুরূদ, যিকর সবই নেক আমল। তাই এগুলোর মাঝে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন, বিয়োজন করা, অথবা এগুলোকে রাসূল r এর উদ্দেশ্য বর্জিত অর্থাৎ তিনি এগুলোকে যে উদ্দেশ্যে করেন নি সে উদ্দেশ্যে করার সুযোগ থাকে কীভাবে? আমাদের সমাজের প্রচলিত 'খতম' কি এর ব্যতিক্রম? খতমের নামে রাসূল r এর সুন্নাত পদ্ধতির ব্যত্যয় ঘটানো, তিনি যে উদ্দেশ্যে এগুলো করেন নি তা করা কতটুকু সিদ্ধ? আল-হামদু লিল্লাহ, দেখা যায় অনেক প্রজ্ঞাবান আলেম যারা যুক্তির উর্ধ্বে রাসূল r এর সুন্নাতকে স্থান দেন, পূর্ণাঙ্গ সুন্নাতের অনুসরণের সর্বদা চেষ্টা করেন, তারা সব সময়ই এসবের বিরোধিতা করে আসছেন। বাংলাদেশে এদের মাঝে অন্যতম বিশিষ্ট মুফতি, সবার কাছেই যার সুন্নাতের পাবন্দির কথা প্রসিদ্ধ, মুফতি ফয়জুল্লাহ রাহ.-আল্লাহ তাকে মাগফেরাত ও রাহমাত দিয়ে ঢেকে নিন- তিনি সর্বদা এসবের কঠোর বিরোধিতা করতেন। তাঁর রচিত কাব্যের কিতাব 'পান্দে নামাহ খাকী'তে প্রচলিত খতম সম্পর্কে একটি পাঠ লিখেছেন, যাতে সর্বপ্রকার খতম বিদ'আত ও সুন্নাহ বহির্ভূত আখ্যা দিয়ে

এসব বিদ'আত কুসংস্কার পরিহার করে সুন্নাতকে আকড়ে ধরার নসীহত করেছেন।[1] তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা 'হামিউস্-সুন্নাহ' মেখল, চট্টগ্রামে অধ্যয়ন থেকেই মূলত সুন্নাত এবং সুন্নাতের ধারক আলেমদের প্রতি মহব্বত এবং বিদ'আতের প্রতি ঘৃণা জন্ম নেয়। আসাতিযায়ে কেরাম সব সময় তাঁর একটি মূল্যবান নসীহত শুনাতেন। নসীহতটি ছিল,

" نیست حجت قول و فعل هیچ پیر * قول حق گو فعل احمد را بگیر"

"কোন পীরের কথা ও কর্ম দলীল নয় * হক্ব বল, আহমদ এর কর্মকে ধর।"

যদিও শয়তানের ধোঁকায় বা না জেনে অনেক সময় সুন্নাত বিরোধি বিদআতি কর্মে লিপ্ত হয়ে যাই। আল্লাহর কাছে তার জন্যে সর্বদা ক্ষমা প্রার্থনা করি।

সুন্নাহ বহির্ভূত এসব খতম পদ্ধতির প্রতি অনীহা থাকা সত্বেও অনেক সময় ঈমানী দুর্বলতা বা পরিবেশ পরিস্থিতিতে নিজেকে এসবের মধ্যে জড়িয়েছি। জড়িয়ে থাকার কারণে এসবের আরো অনেক না-জায়েয দিক সামনে আসলে দিন দিন এগুলোর প্রতি আরো বেশি অনীহা ও সাধারণ জনগণের অজ্ঞতার উপর আফসোস জন্ম নেয়। সহজভাবে সুন্নাহর পদ্ধতিতে নেক আমল পালন করা ছেড়ে দিয়ে অযথা এসবে লিপ্ত হয়ে নিজের সময়, টাকা পয়সা কেন ব্যয় করি? এতে আমার কী লাভ? আমার অজ্ঞতার কারণে এক গোত্রের দুনিয়াবী কিছু স্বার্থ অর্জন হচ্ছে, এই যা। এই কি আমার চাওয়া পাওয়া? একে কি আমি একবারও নবীর সুন্নাতের সাথে মিলিয়ে দেখেছি? আমাদের এসব কর্ম কতটুকু গ্রহণযোগ্য এই কথাটি উপলব্ধি করার জন্য এ বিষয়ে কিছু লিখার ইচ্ছা দীর্ঘ দিন থেকে লালন করে আসছিলাম। সর্বশেষ মহান আল্লাহর ইচ্ছায় এই ক্ষুদ্র রচনাটি লিখতে সক্ষম হয়েছি। এতে যা কিছু ভাল সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর যা মন্দ সব আমি অধমের। এতে কিছু মানুষের উপকার হলে এটাই আমার স্বার্থকতা। এ বিষয়ে সামান্য হলেও আলোচনা করতে পারায় আবারো আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

হাদীসে রয়েছে : "যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেনি সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেনি।"[2] তাই সর্বপ্রথম আমার পিতার জন্য দো'আ করি, আল্লাহ যেন তাকে মাগফিরাত ও রাহমাত দ্বারা বেষ্টন করে নেন। যার সর্বাত্মক চেষ্টার ফলেই হয়ত আল্লাহ তাঁর রহমতে দ্বীনি ইলমের সাথে নিজেকে সংশ্লিষ্ট রাখার তওফিক্ব দিয়েছেন। যিনি দীর্ঘ দিন সরকারী মাদ্রাসায় হাদীসের খেদমাত করলেও আমাকে শুধু এজন্য কওমি মাদ্রাসায় পড়িয়েছেন যাতে করে আমার মাঝে ইলমি দক্ষতা ও সুন্নাতের পাবন্দি এই দুটি জিনিস অর্জিত হয়। জানি না তাঁর এ আশা কতটুকু কার্যকর হয়েছে। আজ তিনি জীবিত থাকলে এই ক্ষুদ্র মেহনতটি দেখলে হয়ত অত্যন্ত খুশি হতেন। আল্লাহ যেন এই খেদমাতটুকু ক্ববুল করেন। ক্ববুল হলে হাদীসের ভাষায় তিনি অবশ্যই এর ছওয়াবের অংশ পাবেন।

এরপর শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি আমার সকল উস্তাদদের যাদের যোগ্যতা ও পরিশ্রমের ফলেই আমার মাঝে যেটুকুই হোক ইলমের বীজ বপন হয়েছে। তাদের ইলমি অনুদানের সাথে সাথে বিভিন্ন জনের আরো বিভিন্ন ধরণের অনুদান রয়েছে, ছোট পরিসরে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই। এক কথায় জীবিত সবার কৃতজ্ঞতা, দীর্ঘ বরকতময় হায়াত কামনা এবং মৃতদের জন্য রাহমাত ও মাগফিরাতের দো'আ করছি। একজনের নাম নিলেই আরেকজনের অবমূল্যায়ন নয়, এর আলোকে যার নাম উল্লেখ না করে পারছি না, তিনি হলেন আমার উস্তায মুহতারাম মুফতি আবুল কালাম যাকারিয়া। যার ইলমি সহ বিভিন্ন অনুদান

আমার রক্তের প্রতিটি কণায় কণায়। তাঁর ঋন পরিশোধ করা আমার পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। দ্বীনি ইলমের কিঞ্চিত যা কিছুই অর্জন করেছি তার সিংহভাগই মূলত তাঁর সাথে দীর্ঘ দিনের সুহবতের ফসল বলে মনে করি। হক্ব বোঝার পর কারো দোহাই দিয়ে এক ইঞ্চি না সরার চেষ্টা মূলত তাঁরই দীক্ষা। আরো কিছু লিখার ইচ্ছা থাকলেও এ কথাগুলো লিখতেই চক্ষু ছলছল করায় আর লিখতে পারছি না। আশাকরি তিনি আমার এই ক্ষুদ্র রচনা দেখে আনন্দিত হবেন এবং এটিকে আমার মাঝে তাঁর নিজের দীক্ষার প্রকাশ মনে করে আমার জন্য দো‘আ করবেন। দো‘আ করি আল্লাহ তাঁর হায়াতকে বরকতময় করে তুলুন। জাতিকে তাঁর থেকে উপকৃত হওয়ার ধারাবাহিকতা দীর্ঘ করে দিন।

রচনাটি লিখার ক্ষেত্রে আরো যারা উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ে সাহস দিয়েছেন তাদের সবার শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। বিশেষ করে মাওলানা আব্দুল্লাহ মানসুর ও আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন ছাত্র হাফেজ মাওলানা ইয়াহ্ইয়া রচনাটির প্রুফ দেখার কষ্ট বরণ করায় তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদের সাথে সাথে তাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ তাদেরকে জাযায়ে খাইর দান করুন।

রচনাটি লিখতে হাদীসের ক্ষেত্রে একমাত্র সহীহ হাদীসের উপরেই নির্ভর করা হয়েছে। দু-একটি হাসান পর্যায়ের হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে যা মুহাদ্দিসীনে কেরামের নিকট গ্রহণযোগ্য। দ‘য়িফ বা দুর্বল কোনো হাদীসের উপর নির্ভর করা হয় নি।

নির্ভুল তথ্য প্রদানের লক্ষে, প্রতিটি হাদীস, অন্যান্য তথ্য, কারো উদ্ধৃতির উপর নির্ভর না করে মূল কিতাব দেখে সেখান থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। সাথে সাথে প্রতিটি হাদীসের অধ্যায়, অনুচ্ছেদ উল্লেখ করার চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে মুদ্রনের কমবেশের কারণে হাদীস বা অন্যান্য তথ্য অনুসন্ধান করে বের করতে বেগ পেতে না হয়।

হাদীস সহ অন্যান্য তথ্যসূত্র টিকা আকারে বাংলায় উল্লেখের সাথে সাথে আলেমগণের সুবিধার্থে মূল মতনের পাশাপাশি আরবীতে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রতিটি তথ্যসূত্র উল্লেখের পাশাপাশি সাধ্যানূযায়ী বর্ণিত কিতাবের লিখকের নাম, তাঁর জন্ম-মৃত্যু বা শুধু মৃত্যু সন মূল বইয়ে অথবা টিকায় উল্লেখ করার চেষ্টা করা হয়েছে। যাতে তাঁর যুগ দেখে আসলাফিয়্যাত তথা সিনিয়ারিটির মূল্যায়ণ করা হয়।

হাদীসের বর্ণনায় বিষয়বস্তু এক থাকা সত্বেও অনেক সময় শব্দের সামান্য ব্যতিক্রম থাকে। তাই অনেক হাদীস একাধিক কিতাবে থাকা সত্বেও একাধিক কিতাবের উদ্ধৃতি দেওয়া হয় নি। বরং যে হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে তা হাদীসের যে কিতাবে হুবহু রয়েছে শুধুমাত্র সেই কিতাবের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে।

নিজের ইলমি ও ভাষাগত দুর্বলতা থাকা সত্বেও এ বিষয়ে রচনার কাজে হাত দেওয়ার সাহস যোগার কারণ পাঠকগণ আশাকরি বুঝতে পেরেছেন। ভুল হতে পারে এই আশায় কোনো কিছু না লিখলে আজ পৃথিবীতে কোনো রচনাই থাকত না। ভুলের উর্ধ্বে থাকার মু‘জিযা একমাত্র আল্লাহর কালামের। ‘মানুষ মাত্রই ভুল’ এই প্রবাদ যিনি বিশ্বাস করেন, তিনি ভুলের সমালোচনা করেন না। নবীগণ ছাড়া কেউই যেখানে ভুলের উর্ধ্বে নয়, সেখানে আমার মত দুর্বলের কথা কী হতে পারে। তাই ভুল থাকবেই। আপনার কাজ হচ্ছে “দীন উপদেশের নাম” হিসেবে বাস্তব ভুলের সংশোধনের পথ খোঁজা। যথাসাধ্য বিশুদ্ধ কথা লিখার চেষ্টা করেছি, তবুও ভুল হওয়াই স্বাভাবিক। তাই যে কোনো ইলমি, ভাষাগত, তথ্যগত ভুল কারো দৃষ্টিগোচর হলে

আমাকে অবগত করা আপনার ইলমি আমানত মনে করবেন। আপনার সঠিক পরামর্শ শ্রদ্ধার সাথে সাদরে গ্রহণ করে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের চেষ্টা করা হবে। ইনশা-আল্লাহ।

বিনীত: মোস্তফা সোহেল হিলালী

সুন্নাতের পরিচয় ও গুরুত্ব

সুন্নাতের পরিচয় ও গুরুত্ব অনেক জরুরী ও দীর্ঘ বিষয়। শরয়ী বিধানের দ্বিতীয় উৎস এই সুন্নাত, তাই তা অনেক দীর্ঘ হওয়ার কথা। উলামায়ে কেরাম এ বিষয়ের উপর অনেক কিতাব রচনা করেছেন।[3] আমাদের মূল আলোচনা সুন্নাত বা বিদ‘আত নিয়ে নয়। তাই এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করার কথা নয়। তথাপি প্রচলিত বিভিন্ন খতম যা আমাদের মূল আলোচনার বিষয় তা বুঝতে সুন্নাত ও বিদ‘আত বোঝার বিকল্প নেই। তাই অত্যন্ত সংক্ষেপে দুটি বিষয়েই একেবারেই সামান্য আলোচনার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ। যাতে করে খতমের তাৎপর্য বুঝা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যায়। বাস্তব কথা হলো, যিনি প্রকৃতপক্ষ সুন্নাত ও বিদ‘আত চিনে নিয়েছেন তার কাছে প্রচলিত খতমের তাৎপর্য আলোচনা করে বোঝাবার প্রয়োজন নেই। যাই হোক, অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে সুন্নাত ও বিদ‘আত দুটি বিষয়কে একটু বোঝার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহর তওফিক কাম্য।

????????? ?????

সুন্নাত শব্দের শাব্দিক বা আভিধানিক অর্থ: ছবি, প্রতিচ্ছবি, প্রকৃতি, জীবন পদ্ধতি, কর্মধারা, রীতি, আদর্শ ইত্যাদি।[4] শরয়ী পারিভাষিক অর্থ উল্লেখ করতে ইবনু মানযুর[5] লিখেন:

"وإذا أطلقت في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وندب إليه قولا وفعلا مما لم ينطق به الكتاب العزيز ولهذا يقال في أدلة الشرع الكتاب والسنة أي القرآن والحديث".

‘‘তবে যখন শরীয়তে সুন্নাত শব্দটি প্রয়োগ করা হয় তখন এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সব বিষয়ের আদেশ করেছেন, যে সব থেকে নিষেধ করেছেন, কথা ও কর্মের মাধ্যমে যে দিকে আহ্বান করেছেন, যা সম্মানিত কিতাব কুরআনে বলা হয় নি। এ জন্যই বলা হয়, শরীয়তের দলীল কিতাব ও সুন্নাত। অর্থাৎ হাদীস এবং কুরআন’’[6]

উসূলে ফিকহের কিতাবাদিতে সুন্নাতের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে:

" السنة في اصطلاح الأصوليين هي "ما صدر عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ غير القرآن" وهذا يشمل: قوله:ـ صلى الله عليه وسلمـ، وفعله، وتقريره، وكتابته، وإشارته، وهمه، وتركه ." (معالم اصول الفقة عند اهل السنة والجماعة 1-118)

‘‘উসূলীদের পরিভাষায় সুন্নাত হচ্ছে, “কুরআন ছাড়া যা কিছুই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রকাশ পেয়েছে” এই সংজ্ঞায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
কথা, কর্ম, স্বীকৃতি, লিখা, ইঙ্গিত, প্রতিজ্ঞা ও বর্জন সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত।”[7]
আল্লামা শাওকানী[8] রাহ. সুন্নাতের সংজ্ঞাটি যেভাবে বর্ণনা করেন:

" وأما معناها شرعًا: أي: في اصطلاح أهل الشرع فهي: قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفعله وتقريره، وتطلق بالمعنى العام على الواجب وغيره في عرف أهل اللغة والحديث، وأما في عرف أهل الفقه فإنما يطلقونها على ما ليس بواجب، وتطلق على ما يقابل البدعة كقولهم: فلان من أهل السنة ". (ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الاصول ، الفصل الاول، في معنى السنة لغة وشرعا 1-95)

‘‘শরয়ী পরিভাষায় সুন্নাতের অর্থ, অর্থাৎ শরীয়তবিদদের পরিভাষায় সুন্নাত হচ্ছে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কাজ ও সমর্থন। ভাষাবিদ ও হাদীস বিশারদদের নিকট ব্যাপক অর্থে তা ওয়াজিব এবং অন্যান্য বিষয়ের উপর প্রয়োগ করা হয়। তবে ফিকহবিদদের পরিভাষায় তারা ওয়াজিব নয় এমন বিষয়ের উপর সুন্নাতের প্রয়োগ করে থাকেন। এর বিপরীতে বিদ‘আত শব্দটি ব্যবহার হয়, যেমন বলা হয়: অমুক আহলুস্-সুন্নাহ।”[9]৭

উপরের সংজ্ঞা থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে, ফিক্বহের পরিভাষায় সুন্নাতের একটি অর্থ, ফরয এবং ওয়াজিব ব্যতীত অন্যান্য আমল।

তবে সুন্নাতের মৌলিক অর্থ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সার্বিক জীবন আদর্শ। ফরয, ওয়াজিব ও নফল সবকিছুর উপর সুন্নাতের ব্যবহার হাদীসে প্রসিদ্ধ।

মোটকথা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন আদর্শই দীন। জীবনাদর্শের বিভিন্ন দিকের গুরুত্বের তারতম্য থেকে বা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা থেকে ফরয, ওয়াজিব, নফল ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। ইবাদতের মধ্যে সুন্নাতের ব্যতিক্রম মানেই দীনের মধ্যে তাহরিফ বা পরিবর্তন। দীনকে আল্লাহ তা‘আলা পরিপূর্ণ করার ঘোষণা[10] এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাদর্শই সর্বোচ্চ আদর্শ বলে ঘোষণা[11] দিয়ে দিয়েছেন। তাই কোনো ধরণের কম-বেশি, যোগ-বিয়োগ করার সুযোগ নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন যে ইবাদত যেভাবে করেছেন তা তখন সেভাবে করতে হবে। এর ব্যতিক্রম করলে তা খেলাফে সুন্নাত বলে অগ্রাহ্য হবে।

[illegible]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাদর্শকে পূর্ণাঙ্গরূপে মেনে নেওয়াই একজন মুমিনের কর্তব্য। তার জীবনাদর্শের বাইরে যাওয়ার চিন্তা করা মুমিন কল্পনা করতে পারেন না। সুন্নাতের বাইরে যাওয়াকে তিনি তার আখিরাতের ঝুঁকি মনে করেন। মুমিন জায়েয না-জায়েযের বাহাসে লিপ্ত না হয়ে হুবহু নবীর আদর্শের উপর থাকাকেই কর্তব্য মনে করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস তাকে এক সুঁতো পরিমাণ বাইরে যেতে দেয় না। কদাচিৎ এমন হয়ে গেলে তিনি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন:

«ما من نبى بعثه الله فى أمة قبلى إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ».)صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب كون النهي عن المنكر من الايمان...، رقم:188)

''আল্লাহ তা'আলা আমার পূর্বে যখনই কোনো জাতির মাঝে নবী প্রেরণ করেছেন তখনই উম্মাতের মধ্যে তার এমন হাওয়ারী ও সাথী দিয়েছেন, যারা তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে চলতেন, তার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। অনন্তর তাদের পরে এমনসব লোক তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে, যারা মুখে যা বলে বেড়াত কাজে তা পরিণত করত না, আর সেসব কর্ম সম্পাদন করত যেগুলোর জন্য তারা আদিষ্ট ছিল না। এদের বিরুদ্ধে যারা হাত দ্বারা জিহাদ করবে তারা মুমিন, যারা এদের বিরুদ্ধে মুখের কথা দ্বারা জিহাদ করবে তারাও মুমিন এবং যারা এদের বিরুদ্ধে অন্তরের ঘৃণা দ্বারা জিহাদ করবে তারাও মুমিন। এর বাইরে সরিষার দানা পরিমানও ঈমান নেই।"[12]

সুন্নাতের উপর থাকার গুরুত্ব এবং এর বাইরে যাওয়ার ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে এই একটি হাদীসই যথেষ্ট। কুরআনের একাধিক জায়গা এবং একাধিক হাদীসে এ বিষয়ের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় সুন্নাত নয়, তাই আর কোনো আয়াত বা হাদীস উল্লেখ করছি না।

সাহাবায়ে কেরাম, তাবিঈন, তাব'য়ি তাবিঈন, অনুসৃত চার ইমাম সহ কল্যাণের সাক্ষ্যপ্রাপ্ত যুগের আলেমগণ উপরোক্ত হাদীসের যথাযথ মর্যাদা রক্ষা করেছেন। আল্লাহ তাঁর দীন তথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শ রক্ষা করার জন্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন নায়েব তৈরী করেছেন। যুক্তি বা বিবেক দ্বারা দীনের মধ্যে নতুন কিছুর সংযোজন, ইবাদতে নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার ইত্যাদির বিরুদ্ধে সজাগ থেকে সর্বদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত সংরক্ষন করার চেষ্টা করেছেন এবং সক্ষম হয়েছেন। সুন্নাতের বাইরে যাওয়া মানেই ভ্রান্তির পথ উন্মুক্ত করা এ কথা বুঝতে তাদেরকে বেগ পেতে হয় নি। সর্বযুগেই আল্লাহ তা'আলা এমন একদল লোকের মাধ্যমে তার নবীর সুন্নাতকে রক্ষা করবেন যারা নবীর হুবহু সুন্নাতের উপর থাকার চেষ্টা করবেন। সুন্নাতের বাইরে কিছু দেখলেই যথাসাধ্য তা প্রতিহত করার চেষ্টা করবেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এই দল বা তাদের সহযোগী হিসেবে কবুল করুন। শাহওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী[13] রাহ. সুন্নাতের উপর থাকার গুরুত্ব বুঝাতে উপরোক্ত হাদীস সহ আরো কিছু হাদীস উল্লেখের পূর্বে লিখেন,

" قد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم مداخل التحريف بأقسامها . وغلظ النهي عنها ، وأخذ العهود من أمته فيها ، فمن أعظم أسباب التهاون ترك الأخذ بالسنة ."

''নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সর্বপ্রকার তাহরিফ তথা দীনের বিকৃতি প্রবেশ করানো থেকে সতর্ক করেছেন,তাহরিফ থেকে কঠোর নিষেধ করেছেন, উম্মত থেকে এ ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন, এ ব্যাপারে শিথিলতার সবচেয়ে বড় কারণ হলো সুন্নাতের উপর আমল ছেড়ে দেওয়া..."[14]

এরপর তিনি হুবহু সুন্নাতের অনুকরণ না করার সতর্কতা সম্বলিত বিভিন্ন হাদীস উল্লেখ করেন। আলোচনা দীর্ঘ হয়ে যাবে বিধায় তা উল্লেখ করছি না। পাঠকের কাছে তার এই আলোচনাটি দেখে নিতে অনুরোধ রইল।

সারকথায় তিনি সুন্নাতের মধ্যে কম বেশ, সংযোজন, বিয়োজন,বাড়াবাড়ি সবকিছুকেই দীনের তাহরীফ বা বিকৃতি গণ্য করেছেন এবং তা বিভিন্ন হাদীস দ্বারা প্রমাণ করেছেন।

সারকথা হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামগ্রিক জীবন-পদ্ধতিই সুন্নাত। যা তিনি ফরয হিসেবে করেছেন তা ফরয হিসেবে পালন করা সুন্নাত। যা নফল হিসেবে করেছেন তা নফল হিসেবে পালন করা সুন্নাত। যা সর্বদা করেছেন তা সর্বদা করা, যা মাঝে মাঝে করেছেন তা মাঝে মাঝে করা সুন্নাত। যা সর্বদা বর্জন করেছেন তা সর্বদা বর্জন করা, যা মাঝে মাঝে বর্জন করেছেন তা মাঝে মাঝে বর্জন করা সুন্নাত। যেই কাজ যেই পদ্ধতিতে করেছেন তা সেই পদ্ধতিতে পালন করাই সুন্নাত। কোনো কিছুতে বেশ কম হলেই খেলাফে সুন্নাত বলে গণ্য হবে। করণীয় বর্জনীয় সকল ক্ষেত্রে তাঁরই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদীস দেখুন:

"جاء ثلاث رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه و سلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه و سلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه و سلم ؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال (أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما والله أني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ". (صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، رقم:4776)

‘‘তিন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের নিকট গিয়ে তাঁর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। যখন তাদেরকে তাঁর ইবাদত সম্পর্কে জানানো হলো প্রশ্নকারী সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদত কিছুটা কম ভাবলেন বলে মনে হলো। তারা বললেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কি আমাদের তুলনা হতে পারে? আল্লাহ তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল গোনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। (তাঁর কোনো গোনাহ নেই, আর আমরা গোনাহগার উম্মত, আমাদের উচিৎ তাঁর চেয়ে বেশি ইবাদত করা) তখন তাদের একজন বললেন: আমি সর্বদা সারা রাত জেগে নামায পড়ব। অন্যজন বললেন: আমি সর্বদা রোজা রাখব, কখনই রোজা ভাঙ্গব না। অন্যজন বললেন: আমি আজীবন নারী সংসর্গ পরিত্যাগ করব, কখনো বিবাহ করব না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কথা জানতে পেরে তাদের কাছে এসে বললেন: তোমরাই কি এমন এমন কথা বলেছ? তোমরা জেনে রাখ! আমি তোমাদের সকলের চেয়ে বেশি আল্লাহকে ভয় করি, আমি তোমাদের মধ্যে সর্বোচ্চ তাক্বওয়াবান। তা সত্বেও আমি মাঝে মাঝে নফল রোজা রাখি, আবার মাঝে মাঝে নফল রোজা রাখা পরিত্যাগ করি। রাতে কিছু সময় নফল সালাত আদায় করি আবার কিছু সময় ঘুমাই। আমি বিবাহ করি। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত অপছন্দ করল তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।’’[15]

পাঠক, একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করুন। এখানে তিনজন সাহাবীর কেউই নাজায়েয কোনো কাজের ইচ্ছা পোষণ করেন নি। প্রত্যেকেই ভালো কাজের নিয়ত করেছেন। নফল নামায কতই না উত্তম ইবাদত, নফল সালাতের মাধ্যমে সময় কাটানো মুমিনের উত্তম ব্যবস্থা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই

বলেছেন বলে উল্লেখ রয়েছে।[16] নফল সিয়াম পালন করা কতই না উত্তম কাজ। বেশি বেশি ইবাদতের জন্য বিবাহ শাদিতে নিজেকে জড়িত না করা কতই না উত্তম নিয়ত বা কল্পনা। তথাপি এই কর্মগুলোকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নাত অপছন্দ বলে আখ্যায়িত করলেন তার কারণ কি? সাধারণ অপছন্দ নয়, এমন অপছন্দ যার কারণে তাঁর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যায় না। বাহ্যত তাদের এমন নিয়তের উপর নবীজীর বাহবা দেওয়ার কথা ছিল। মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, এমন অনেক বাহবামুলক শব্দ প্রয়োগ করে, আমি যা পারি না তোমরা তা করছ বলে তাদেরকে বুকে জড়িয়ে ধরার কথা। আমাদের যুক্তি বা সমাজের বাস্তব চিত্র এমনটিরই দাবী রাখে। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্টো তাদের উপর রাগ করলেন কেন? বাহ্যত বিষয়টি একটু উল্টো মনে হলেও একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে আমাদের জন্য এর রহস্য বুঝতে কোনো সমস্যা হবে না। কেননা ইবাদত মূলত কম বা বেশি করার নাম নয়। বরং আল্লাহর হুকুম তাঁর রাসূলের পদ্ধতির পূর্ণ অনুসরণ করে পালনের নাম। এখানে যদিও মূল ইবাদতের মধ্যে পূর্ণ অনুসরণের বৈপরিত্য নেই, তথাপি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাদর্শের সাথে বৈপরিত্য আবশ্যই। কেননা, রাত কাটাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত হচ্ছে, কিছু সময় সালাত আদায় করা,কিছু সময় ঘুমানো। যিনি সারা রাত সালাতে কাটাচ্ছেন তাঁর আমল বেশি হলেও রাত কাটানোটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত মোতাবেক নয়। ঠিক এমনিভাবে সিয়াম ও বিবাহের বিষয়টিও। এমন আমলকারীর মনে ধীরে ধীরে সুন্নাতের প্রতি অবজ্ঞা জন্ম নেয়। সুন্নাত মোতাবেক চলা তার কাছে কম মনে হয়। যেমনটি সাহাবিদের মত ব্যক্তিত্বের মনে জড় বাঁধতে শুরু করেছিল বলে বর্ণিত হাদীস থেকেই আমরা বুঝতে পারছি। এটি একটি বাস্তব বিষয় যা আমরা আমাদের সমাজ বা আমাদের নিজ থেকেই যাচাই করতে পারি। যেমন ধরুন, এক ব্যক্তি রাতে এশার সালাত জামাতে আদায় করে ঘুমিয়ে পড়েন, রাতের শেষভাগের দিকে উঠে তাহাজ্জুদ পড়েন এবং ফজরের সালাত জামাতে আদায় করেন। আরেক ব্যক্তি এশা এবং ফজর জামাতে আদায়ের সাথে সাথে সারা রাত জেগে সালাত আদায় করেন, স্বাভাবিকত দ্বিতীয় ব্যক্তির মনে একথা জড় পাকাবে যে, আমি প্রথম ব্যক্তির চেয়ে বেশি ইবাদত করছি, তার থেকে আমার কাজ উত্তম, কেননা সে কিছু সময় ঘুমিয়ে নামাযের মত শ্রেষ্ট ইবাদত থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, আল্লাহর শোকর আমি বঞ্চিত হচ্ছি না। তার মনে একথার জড় না পাকালে তিনি প্রথম ব্যক্তির মত কিছু সময় ঘুমানোর কথা। যদি আমরা ধরেই নেই যে, তিনি এমন মানুষ যার মাঝে এমন কল্পনা আসতে পারে না, তবে অন্য মানুষের মনে একথার বীজ অবশ্যই বপন হবে। সমাজের সাধারণ থেকে নিয়ে বড় বড় ব্যক্তিত্বের কথাবার্তা থেকে এমন বিশ্বাস পাওয়া যায়। যেমন কেউ সারা রাত জেগে ইবাদত করলে তাকে ঐ ব্যক্তির চেয়ে বেশি তুলে ধরা হয় বা বেশি পরহেযগার মনে করা হয়, যিনি রাতে তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করেছেন আবার ঘুমিয়েছেন। যেমন বলা হয়, অমুক এত বছর ঘুমাননি, অমুক এত বছর এক অযু দিয়ে এশা এবং ফজর আদায় করেছেন[17]। এবার আপনি প্রথম ব্যক্তি ও দ্বিতীয় ব্যক্তিকে নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের সাথে তুলনা করুন। প্রথম জনের রাতের ইবাদত কম, তবে রাত কেটেছে সুন্নাত মোতাবেক। দ্বিতীয় জনের রাতের ইবাদত বেশি, তবে তাঁর রাত হুবহু সুন্নাত মোতাবেক কাটেনি। এই দুই ব্যক্তির মাঝে দ্বিতীয় ব্যক্তির রাত কাটানোকে উত্তম মনে করা সুন্নাতের প্রতি অবজ্ঞার নামান্তর। কেননা যার রাত কাটানো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মিলল তাকে অনুত্তম, আর যার রাত

কাটানো তাঁর সাথে মিলেনি তাকে উত্তম মনে করা সুন্নাতকে অনুত্তম মনে করা ছাড়া কিছু নয়। এভাবে লোকটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদ্ধতি থেকে সরে যাওয়া এবং অন্য পদ্ধতিকে উত্তম জ্ঞান করা তাঁর মনে স্থান নিবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে তাঁর ইবাদত বেশি এ কথা দিলে বদ্ধমুল হবে। আর এ কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত সাহাবিদের উপর তাদের নিয়ত মহৎ থাকা সত্বেও রাগ করেছেন।

মোটকথা: সর্বক্ষেত্রে আমাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করতে হবে। তবেই আমরা আমাদেরকে মুত্তাবি‘য়ি সুন্নাত বা সুন্নাত অনুসারী বলে দাবী করতে পারব। নামাযে তার কি শিক্ষা, তিনি কীভাবে তা আদায় করতেন, কোনো নামাযকে কতটুকু গুরুত্ব দিতেন। রোজার ক্ষেত্রে তার কি শিক্ষা, তিনি কোনো রোজা কতটুকু গুরুত্ব দিয়ে আদায় করতেন। এভাবে প্রতিটি ইবাদতের ক্ষেত্রে তার কি শিক্ষা, কি পদ্ধতি সবকিছুই আমাদেরকে তাকে ফলো করতে হবে।

কুরআন তেলাওয়াতে তাঁর কি শিক্ষা, তিনি কীভাবে কুরআন তেলাওয়াত করতেন, কী উদ্দেশ্যে তেলাওয়াত করতেন, তাঁর আদর্শ থেকে গ্রহণ করতে হবে। হাদীসের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর সাহাবিদের কি শিক্ষা দিলেন, সাহাবিরা হাদীসের সাথে কি আচরণ করলেন, তাঁর হাদীসের মাধ্যমে আমাদের কী করা উচিত, সর্বক্ষেত্রে তাঁর আদর্শ বিদ্যমান। এভাবে কালেমার ক্ষেত্রে তিনি কী শিক্ষা দিলেন, যিকরের বেলায় তার শিক্ষা কী, তিনি যিকরে কী কী শব্দ ব্যবহার করেছেন, তিনি কোন যিকর কোন পদ্ধতিতে করতেন তা জেনে সেই পদ্ধতিতেই আমল করতে হবে। অনুরূপ তাসমিয়া, দো‘আ, এক কথায় কোনো আমলের ক্ষেত্রেই তার শিক্ষা ও আদর্শের বাইরে যাওয়া যাবে না। তার আদর্শের ব্যতিক্রম করতে কোনো যুক্তি যোগ করা যাবে না। তবেই আমরা আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামাতের অনুসারী বলে নিজেকে দাবী করতে পারব। আল্লাহ আমাদেরকে তার রাসূলের সুন্নাতের পূর্ণ অনুসরণ করার তওফিক দিন। আমীন।

@@@@@

বিদ‘আতের পরিচয় ও পরিণাম

???????? ???????

বিদ‘আত শব্দের শাব্দিক অর্থ নব উদ্ভাবন। প্রখ্যাত ভাষাবিদ ইবনু মানযুর লিখেন : “বিদ‘আত অর্থ : নতুন সৃষ্ট এবং দীনের পূর্ণতার পর যা উদ্ভাবন করা হয়েছে”।[18] দ্বিতীয় অর্থটি মূলত পরিভাষিক। ইবনু ফারিস[19] বিদ‘আতের অর্থ লিখেন : পূর্ব নমুনা ব্যতিরেকে কোনো কিছু সৃষ্টি করা, শুরু করা বা প্রচলন করা।[20]

লিসানুল আরব অভিধান থেকে আমরা শাব্দিক অর্থের সাথে সাথে বিদআতের পরিভাষিক অর্থ জানতে পেরেছি। আরেকটু স্পষ্ট হওয়ার জন্য ফিক্বহী পরিভাষায় বিদ‘আতের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয় তা উল্লেখ করা

হল :

"البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية".(الاعتصام، الباب الأول في تعريف البدع وبيان معناها....1،26-1)

''বিদ‘আত হচ্ছে, দীনের মধ্যে আবিষ্কৃত পদ্ধতি, যা শরয়ী পদ্ধতির সামঞ্জস্য, এই পদ্ধতির উপর চলার সেই উদ্দেশ্য যা শরয়ী পদ্ধতির উপর চলার উদ্দেশ্য।”[21]

কেউ কেউ বলেন :

“দীনের মধ্যে আবিষ্কৃত পদ্ধতি, যা শরয়ী পদ্ধতির সামঞ্জস্য, এই পদ্ধতির উপর চলার উদ্দেশ্য হলো : আল্লাহ সুবহানাহুর ইবাদতের মধ্যে বৃদ্ধি করা।”[22]

শরয়ী পদ্ধতি বলতে ইবাদতের সুন্নাত পদ্ধতি বুঝানো হয়েছে। কেননা সুন্নাত পদ্ধতি বা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবাদত জাতীয় যে বিষয়ে তিনি যে পদ্ধতি উম্মতকে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন তাই শরয়ী পদ্ধতি। এর বাইরে কোনো শরয়ী পদ্ধতি নেই। এই অর্থেই আহলুস্সুন্নাহ শব্দের বিপরীতে আহলুল বিদ‘আহ শব্দটি উলামায়ে কেরাম প্রয়োগ করে থাকেন বলে আমরা ইতোপূর্বে দেখে এসেছি।

বিভিন্ন হাদীসে বিদ‘আত বা নব উদ্ভাবিত বিষয় বুঝাতে ‘মুহদাসাত’ শব্দটিও ব্যবহার করা হয়েছে, যা একটু পরেই আমরা দেখতে পাব ইনশাআল্লাহ। বিদ‘আত বা মুহদাসাতের শরয়ী সংজ্ঞা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, শরীয়তের পরিভাষায় বিদ‘আত শুধুমাত্র ইবাদত কেন্দ্রিক বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হবে। যে কোনো নব অবিস্কৃত জিনিসের উপর শাব্দিক অর্থে বিদআতের প্রয়োগ করা গেলেও শরয়ী অর্থে তার উপর বিদ‘আত শব্দ প্রয়োগ হবে না এবং তা বিদ‘আত ও মুহদাসাত সংক্রান্ত হাদীসের আওতাধীন হবে না। যেমন ধরুন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটে সওয়ার হয়ে সফর করেছেন, যানবাহনের আবিষ্কার আজ আপনাকে বিমান আরোহন করাচ্ছে, আপনি বিমান আরোহন করে সফর করছেন। বিমান নব আবিষ্কার। উটের পরিবর্তে আপনি বিমান আরোহন করছেন। এটাকে শরয়ী বিদ‘আত বলা যাবে না। কেননা উট বিমান কোনোটি ইবাদত নয়। এটি একটি বাহন মাত্র। তবে বাহনে সওয়ার হতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দো‘আ পড়তেন, তিনি সফরের যে দো‘আ পড়তেন তা ইবাদত। এই দো‘আর মধ্যে কোনো সংযোজন বা বিয়োজন করার সুযোগ নেই। এই দো‘আ তিনি যে পদ্ধতিতে পড়তেন আমাকেও সেই পদ্ধতিতেই পড়তে হবে। যুক্তির আলোকে এখানে কোনো পরিবর্তন ঘটানো যাবে না। যেমন, উট একটি সাধারণ জন্তু, সে মাটিতে চলে, নবীজী উটে উঠতে এই দো‘আ পড়তেন। আমি আজ আকাশে চড়ছি, এই নেয়ামত অনেক বড়, সুতরাং দো‘আকে একটু বৃদ্ধি করতে হবে। অথবা নবীজী স্বাভাবিকভাবে দো‘আ পড়তেন, কেননা নেয়ামতটি স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু আমার নেয়ামতটি অসাধারণ, তাই বিমানে উঠেই সেজদায় পড়ে এই দো‘আ করতে হবে,অথবা সেজদায় পড়ে দো‘আটি পড়লে ছওয়াব বেশি হবে, এজাতীয় চিন্তাধারা সবই ভ্রান্ত। কেননা দো‘আ একটি ইবাদত। আর ইবাদতের ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদ্ধতির বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। গেলেই তা বিদ‘আত বলে গণ্য হবে। মোটকথা : বিদ‘আতের সম্পর্ক ইবাদতের বিষয় ও তার পদ্ধতির সাথে। বস্তুর সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

জনৈক ব্যক্তি একবার এক বিদ‘আত বিরোধী আলেমকে গিয়ে বললেন : আপনারা সবকিছুই শুধু বিদ‘আত বিদ‘আত করেন, তবে আপনি চশমা পরেছেন কেন? আল্লাহর রাসূল কি জীবনে কখনো চশমা

পরেছেন? চশমা তো নবীজীর সময়ে ছিল না, তাহলে এটা কি বিদ‘আত নয়?আলেম বললেন : ভাই, তাহলে তো আপনি নিজেই বিদ‘আত। আপনিও তো নবীজীর সময়ে ছিলেন না। বিদ‘আত না বোঝার কারণেই মাঝে মাঝে এমন কৌতুকের সৃষ্টি হয়। চশমা কোনো ইবাদত নয়। তাই এর সাথে বিদআতের কোনো সম্পর্ক নেই। যেমন লোকটি নিজে কোনো ইবাদত নয়,তাই সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় না থাকা, আবার এখন থাকা বিদ‘আতের বিষয় নয়। যে ইবাদত বা তার পদ্ধতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রমাণিত নয় একমাত্র তার আবিষ্কার শরয়ী পরিভাষায় বিদ‘আত বলে গণ্য হবে।

??????? ??????

বিদ‘আত মানেই ক্রমান্বয়ে দীনের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাওয়া। কেননা দীন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক অনুমোদিত জীবন পদ্ধতির নাম। তাঁর পদ্ধতি থেকে বিভিন্ন যুক্তির আলোকে যে ব্যক্তি বেরিয়ে পড়ে, সে মূলত দীন থেকেই বেরিয়ে পড়ে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদ্ধতি থেকে যে যতটুকু বের হয়, সে মূলত ততটুকু দীন থেকে বের হয়। তাই এব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে পূর্ব থেকে সতর্ক করে গেছেন, যাতে করে যুক্তির আলোকে কেউ তাঁর দেখানো আদর্শ ও পদ্ধতি থেকে সরে না যায়। ইরবায ইবন সারিয়া আস্সুলামি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

" وعظنا رسول الله صلى الله عليه و سلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل : إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله ؟ قال : أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ ". (سنن الترمذي، كتاب العلم عن رسول الله، باب ما جاء في الاخذ بالسنة واجتناب البدعة، رقم:2676)

‘‘একদিন ফজরের সালাতের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী নসীহত করলেন, এতে সবার চোখে অশ্রু বয়ে গেল, হৃদয়গুলো ভীত শঙ্কিত হলো। এক লোক বলে উঠল : নিশ্চয় এটি বিদায়ী নসীহত, অতএব আপনি আমাদের থেকে কী অঙ্গিকার নিবেন হে আল্লাহর রাসূল? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমি তোমাদেরকে আল্লাহভীতি অর্জনের ওসিয়্যত (অঙ্গিকার, গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ) করছি, নেতার কথা মান্য ও তাঁর আনুগত্যের নির্দেশ দিচ্ছি, যদিও সে হাবশী দাস হয়। কেননা তোমাদের মধ্যে যে জীবিত থাকবে সে অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। আর তোমরা সব নব অবিস্কৃত বিষয় থেকে বেঁচে থাকবে, কেননা এগুলো পথভ্রষ্টতা। তোমাদের মধ্যে যে এই অবস্থা পাবে সে যেন আমার সুন্নাত এবং খুলাফায়ে রাশিদিনের সুন্নাত আকড়ে ধরে। তোমরা সুন্নাতকে মাড়ির দাঁত দিয়ে আকড়ে ধর।’’[23]

বিদ‘আত কাকে বলে বুঝতে এবং তা থেকে সতর্ক থাকতে সুন্নাত প্রেমিকদের জন্য এই একটি হাদীসই যথেষ্ট। আল্লাহর রহমতে সর্বদা একদল এর উপর ছিলেন বলেই সুন্নাত সংরক্ষিত হয়ে আমাদের পর্যন্ত পৌছেছে। জান্নাতে পৌঁছতে, তাযকিয়ার চূড়ান্তে উপনীত হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতই আমাদের জন্য যথেষ্ট। সুন্নাতের বাইরে কোনো কিছুকে যে কোনো ক্ষেত্রে মনে স্থান দেওয়া মানেই

গোমরাহীর পথ খুলে দেওয়া, যা উপরোক্ত হাদীসে স্পষ্ট। এভাবে বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীনের মধ্যে পরিবর্তন পরিবর্ধন করার কঠিন পরিণতি সম্পর্কে আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন।

সাহল ইবনে সা'দ, আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত একটি হাদীস দেখুন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

" إني فرطكم على الحوض من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم، فأقول إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي " . (صحيح البخاري،كتاب الرقاق، باب في الحوض، رقم:6212، كتاب الفتن، باب ما جاء في قول الله تعالى { واتقوا فتنة...، رقم:6643)

''আমি তোমাদের আগে হাওযে গিয়ে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করব। যে আমার কাছে যাবে সে (হাউয থেকে) পান করবে, আর যে পান করবে সে কখনো পিপাসার্ত হবে না। অনেক মানুষ আমার কাছে (হাওযে পানি পানের জন্য) আসবে, যাদেরকে আমি চিনব,তারাও আমাকে চিনবে, তবে তাদের এবং আমার মাঝে বাঁধা সৃষ্টি করা হবে, (আমার কাছে আসতে দেওয়া হবে না) আমি বলব এরা আমার উম্মত। তখন (প্রতি উত্তরে) বলা হবে : আপনি জানেন না, এরা আপনার পরে কী সব নব উদ্ভাবন করেছিল। একথা শুনে আমি বলব : যারা আমার পর পরিবর্তন করেছেন তারা দূর হয়ে যাক, তারা দূর হয়ে যাক!"[24]

ইবাদতের যে কোনো নবআবিষ্কৃত পদ্ধতি বিদ'আত। এতে জড়িত হওয়ার কী করুণ পরিণতি তা আমরা লক্ষ্য করতে পেরেছি। তেলাওয়াত,যিকর, দো'আ, দুরূদ ইত্যাদির নতুন পদ্ধতি আবিস্কারের কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তাড়িয়ে দিলে আমাদের মত হতভাগা আর কে আছে? আরো লক্ষ্যণীয় যে, নবীজী সবচেয়ে বেশি যে জিনিস থেকে বারণ করতেন তা হচ্ছে বিদ'আত। সর্বদা বারণের কারণ আশাকরি স্পষ্ট হয়েছে।

এবার নবীজীর খুতবার সিফাত বর্ণনার হাদীসটি দেখি:

" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته : يحمد الله ويثني عليه بما هو له أهل ثم يقول : من يهد الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له إن أصدق الحديث كتاب الله و أحسن الهدى هدى محمد و شر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار". (صحيح ابن خزيمة، باب صفة خطبة النبي **r**، رقم: **1785)**

''রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর খুতবায় প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও তার যথাযথ গুণাবলী বর্ণনা করতেন, এরপর বলতেন: যাকে আল্লাহ হেদায়াত প্রদান করেন তাকে কেউ গোমরাহ করতে পারে না, আর যাকে আল্লাহ গোমরাহ করেন তাকে কেউ হেদায়াত প্রদান করতে পারে না। নিশ্চয় সর্বাধিক সত্য কথা আল্লাহর কিতাব এবং সর্বাধিক সুন্দর আদর্শ মুহাম্মদের আদর্শ, নব উদ্ভাবিত বিষয় সর্বাধিক নিকৃষ্ট, প্রত্যেক নব উদ্ভাবিত বিষয় বিদ'আত, প্রত্যেক বিদ'আত ভ্রষ্টতা এবং এবং প্রত্যেক ভ্রষ্টতা জাহান্নামে নিক্ষেপ্ত।"[25]

উপরোক্ত হাদীসটির দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনে আমাদের যত কথা বলে গেছেন সবই হাদীস। তিনি যা বলেছেন, যা করতে নির্দেশ দিয়েছেন তা কতবার বলেছেন? নিশ্চয় একবার, দুইবার, তিনবার, একাধিক বার, ক্ষেত্র বিশেষে অনেক বার। কিন্তু উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত কথাগুলো তিনি কতবার বলেছেন? নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনে কতটি খুতবা দিয়েছেন? একটি? দুইটি? একাধিক? অনেক? অগণিত? যতবারই তিনি খুতবা দিয়েছেন, উপরের বিষয়গুলো আলোচনা করতেন বলে আমরা জানতে পারলাম। এখান থেকে একটি ধারণা নেই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনে কতবার বলেছেন: “একমাত্র আদর্শ তাঁরই আদর্শ, তাঁর আদর্শের বাইরের সবকিছুই নব উদ্ভাবিত, সব নব উদ্ভাবিত কর্ম বিদ‘আত, সব বিদ‘আতই গোমরাহী এবং প্রত্যেক ভ্রষ্টতা জাহান্নামে নিক্ষেপ্ত।” এছাড়া অন্যান্য হাদীসতো আছেই। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শ বহির্ভূত কোনো আমল গ্রহণযোগ্য নয়, চাই তা যে কোনো উদ্দেশ্যেই হোক না কেন।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হাদীসটি দেখুন:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد". (صحيح البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم: 2550، صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، رقم: 4589)

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: আমাদের এই দীনে যে ব্যক্তি নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে তা প্রত্যাখ্যাত।”[26]

এই হলো বিদ‘আতের অবস্থা। আমলের ক্ষেত্রে সুন্নাতের বিপরীত চিন্তা মানেই বিদআতে লিপ্ত হওয়ার প্রক্রিয়া, আর বিদ‘আত মানেই দীন ধ্বংসের প্রক্রিয়া। তাই সাহাবায়ে কেরাম ও কল্যাণপ্রাপ্ত যুগ তথা খাইরুল কুরুনের আলেমদেরকে এব্যাপারে সর্বাধিক সতর্ক থাকতে দেখা গেছে। বিদ‘আত দূরের কথা, বিদ‘আতের সন্দেহযুক্ত বিষয়কেও তারা প্রত্যাখ্যান করে চলেছেন। এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা রাহ.কে এতই সতর্ক থাকতে দেখা যায় যে, প্রমাণিত সুন্নাতের মাঝেও সমান্যতম হেরফের হলেই তিনি তা বিদ‘আত বলে আখ্যায়িত করতেন এবং এ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিতেন। ফিক্বহে হানাফিতে বিদ্যমান অসংখ্য মাস‘আলা এর জলন্ত প্রমাণ। এথেকেই হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত হলো: কোনো বিষয় সুন্নাত ও বিদ‘আতের মাঝে সংশয়যুক্ত হলে তা বিদ‘আত বলে গণ্য করে পরিহার করতে হবে। কারণ কাজটি যদি বাস্তবেই সুন্নাত হয়ে থাকে তবে ছেড়ে দিলে গোনাহগার হবে না, শুধুমাত্র ছওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে, কিন্তু বিদ‘আত হয়ে থাকলে গোনাহ্ হবে। তাই ইমাম আবু হানিফা রাহ. এমন কাজ ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করতেন। আর ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় এড়িয়ে চলাই জ্ঞানির কাজ। আল্লামা সারাখসী[27] লিখেন:

"وما تردد بين البدعة والسنة يتركه لأن ترك البدعة لازم وأداء السنة غير لازم (المبسوط،2-146)."

“আর যে বিষয়টি বিদ‘আতও হতে পারে আবার সুন্নাতও হতে পারে বলে উভয় সম্ভাবনা রয়েছে এমন বিষয় পরিত্যাগ করবে, কেননা বিদ‘আত পরিত্যাগ করা অপরিহার্য জরুরী, আর সুন্নাত পালন করা অপরিহার্য

নয়।”[28]

তিনি অন্যত্র লিখেন:

"وما تردد بين المباح والبدعة لا يؤتى به فإن التحرز عن البدعة واجب... وما تردد بين السنة والبدعة لا يؤتى به".(3-357)

“যে বিষয়টি বৈধও হতে পারে আবার বিদ‘আত হতে পারে বলে উভয় সম্ভাবনা রয়েছে এমন বিষয়ের উপর আমল করা যাবে না,কেননা বিদ‘আত পরিহার করে চলা ওয়াজিব,... এবং যে কাজ সুন্নাতও হতে পারে আবার বিদ‘আতও হতে পারে বলে উভয় সম্ভাবনা রয়েছে এমন কাজ করা যাবে না।”[29]

এই ছিল খাইরুল কুরুন থেকে নিয়ে হানাফী মাযহাবের মূলধারার আলেমদের আদর্শ। তাই বিভিন্ন দো‘আ দুরূদ ইত্যাদির মাঝে নতুন যে কোনো সংযোজনের সবই তাদের যুগের অনেক পরের সৃষ্ট বলে দেখতে পাবেন।

এখন বিভিন্ন আমল, আমলের বিভিন্ন পদ্ধতি, দুরূদের বিভিন্ন পদ্ধতি, যিকরের বিভিন্ন পন্থা, সংযোজন বিয়োজন। দো‘আ, যিকর, তাসবীহ,তাহলীল ইত্যাদির নতুন সংখ্যা ও তার লাভ নির্ধারণ। ইবাদতের নতুন নতুন উদ্দেশ্যের প্রণয়ন করে যদি বলি তা বিদ‘আত নয় তবে, আমি আমার নিজেকে সম্বোধন করে বলব: তুমি পৃথিবীর কাউকে বিদ‘আতি বলে আখ্যায়িত করো না। রাসূলের আদর্শ ও উদ্দেশ্য বর্জিত হয়ে তোমার কাজ যদি বিদ‘আত না হয়, তবে যাকে তুমি বিদ‘আতি বলছ তাঁর কাজ বিদ‘আত হবে কেন? তোমার বানানো পদ্ধতি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পন্থায় না হলেও তুমি তোমার ইলম, কুরআন, হাদীস, যুক্তি ইত্যাদির অকাট্য (?) দলীল দ্বারা জায়েয প্রমাণ করতে পার। তবে তুমি যাকে বিদ‘আতি বলছ তাঁর কাছেও তোমার মত হাজারো দলীল রয়েছে। আলোচনা আর দীর্ঘ না করে আমাদের মূল বিষয়ে চলে যাচ্ছি। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিকভাবে বিদ‘আত বুঝা ও তা এড়িয়ে চলার তওফিক দিন। আমীন।

????: শাইখ মুস্তাফা সোহেল হিলালী

????????: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

?????: ইসলামহাউজ

http://www.healthprose.org/ http://www.handlestresshelp.com/
https://www.hillsfarmacy.com/
http://www.ambienonlinebuycheap.com/